হয়নি। স্নিগ্ধা জানে না এই নাটকটা ও করতে পারবে কিনা। ও ভিতরে একরকম আর বাইরে অন্যরকম হয়ে থাকতে পারে না।

শাড়িটা পিসিদের পছন্দ না হলেও স্নিগ্ধার বেশ ভালোই লেগেছিল। আজ অনেকদিন পর নিজেকে শাড়িতে দেখছে সে। শাড়িটা তাকে মানিয়েছে বেশ। সেদিন দোকানদারটাও বলেছিল এই শাড়িতে আপনাকে খুব ভালো লাগবে দিদি। স্নিগ্ধা জানে এই অযাচিত প্রশংসা শুধুমাত্র তার রাগ প্রশমনের উদ্দেশ্যে। তবুও স্নিগ্ধার ভালো লেগেছিল। সব মেয়েরাই নিজের সৌন্দর্যের তারিফ দারুণভাবে উপভোগ করে। দোকান থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসতে আসতে রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল সেদিন। চারদিকে দোকানপাট সব বন্ধ করতে শুরু করেছে আকাশের ভাবগতিক দেখে। দর্জির দোকানে বসে তারা বুঝতেই পারেনি আকাশটা এত খারাপ হয়ে আছে। আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও একটি গাড়িও পায়নি তারা। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

বিছানার উপর ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠায় চমকে ওঠে স্নিগ্ধা। অর্পিতার ফোন।

ফোন করেছিলি – শুকনো গলায় বলল অর্পিতা। স্নিগ্ধা বুঝল পিসিকে দেখে ফোনটা কাটলেও মিসড্ কল হয়তো চলে গিয়েছিল অর্পিতার কাছে। বলল – হ্যাঁ, কেমন আছিস?

– ভালো, বাড়ির সবাই কি বলল? পুলিশে ডায়রি করবি?

– জানি না।

– আমার মনে হয় তোর একবার রাজেশকে ব্যাপারটা বলা উচিত।

– হ্যাঁ, দেখি। তুই বাড়িতে বলেছিস?

– তোর কথা ভেবে এখনও বলিনি।

– ঠিক আছে রাখি। ঘরে কারও ঢোকার শব্দে তাড়াতাড়ি ফোনটা কেটে দেয় স্নিগ্ধা।

দুই পিসি ও মা ঘরে ঢুকলে স্নিগ্ধা ঘুরে তাকায় ওদের দিকে।

– কী সুন্দর লাগছেরে তোকে। ছোট পিসি স্নিগ্ধার চিবুক ধরে বলল।

বড় পিসি বলে – মুখে একটু হাসি তো আনবি। অত মনমরা হয়ে থাকলে চলে। সবাই এমন একটা ভাব করছিল যেন স্নিগ্ধাকে প্রথমবার দেখতে এসেছে রাজেশ। স্নিগ্ধা তার মা-র দিকে তাকায় একবার। মা ঈষৎ হাসল। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে কোথাও যেন একটা বিষাদ লেগেছিল। মা-র চোখ দু'টি যেন তার কানে কানে বলছে, তোর এই যন্ত্রণায় আমিও সমব্যথী। কিন্তু আমারও যে কিছু করার নেই।

সেদিন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে মাকেই ফোন করেছিল স্নিগ্ধা। একে তো ঝোড়ো হাওয়া তার উপর বৃষ্টির জলে ভিজে একসা হয়েছিল তারা। মা বলেছিল, যেখানে লোকজনের ভিড় দেখবি সেখানে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাক। গাড়ি পাঠাচ্ছি। কিন্তু ভিড় তো দূর অস্ত রাস্তাঘাট যে একেবারে জনশূন্য। মাকে ভয়ার্ত গলায় বলেছিল স্নিগ্ধা। দূরে একটি গাড়ির লাইট এগিয়ে আসতে দেখে মাকে বলেছিল – ঠিক আছে রাখ। একটা গাড়ি আসছে বোধ হয়।

গাড়িটি কাছে এলে তারা দু'জন বৃষ্টি মাথায় রাস্তায় নেমে আসে। গাড়িটি তাদের সামনে এসে দাঁড়ালে গাড়ির ভিতরের লাইট জ্বলে ওঠে। গাড়ির ভিতর দু'জন বসে আছে। স্নিগ্ধা লক্ষ করল, তাদের একজনের হাতে মদের বোতল। তাদের দেখে ছেলেটি বোতলটিকে সিটের নীচে লুকিয়ে ফেলল। জানালার কাচ নামিয়ে ড্রাইভারটাই বলল, কোথায় যাবে? স্নিগ্ধা অর্পিতার হাত ধরে পিছিয়ে আসে। বলে, না, আমাদের গাড়ি আসছে। এরই মধ্যে পিছনে বসা একটি ছেলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধার সামনে দাঁড়ায়। তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। মাতাল কণ্ঠে ছেলেটি বলে – চলো এগিয়ে দিই। তারা দু'জনে আরও একটু পিছিয়ে গেলে ছেলেটি স্নিগ্ধার হাত শক্ত করে টেনে ধরে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। ভয়ে চিৎকার করে স্নিগ্ধা বলে ওঠে – বাঁচাও। অর্পিতাও ছেলেটিকে ঘুষি মারতে থাকে দুর্বল হাতে। ততক্ষণে অন্য ছেলেটিও গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। অর্পিতাকে এক ধাক্কায় ফেলে দেয় মাটিতে। হঠাৎ ড্রাইভারটা বলে ওঠে – পালা, পালা, ছেড়ে দে। উল্টোদিক থেকে আর একটা গাড়িকে আসতে দেখে দু'টি ছেলেই গাড়িতে ঢুকে পড়ে। নিমেষে বেরিয়ে যায় গাড়িটি।

বাড়িতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল স্নিগ্ধা। অর্পিতাও কাঁদছিল। খবর শুনে সেই রাতেই তার পিসিরা চলে এসেছিল বাড়িতে। স্নিগ্ধার মা-ই বলেছিল পুলিশে কেস করার কথা। বাবাও বলেছিল – রাতেই থানায় যাওয়া দরকার। বৃষ্টিটাও তো কমে এসেছে। বড় পিসি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে – দাঁড়াও, সব ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো কোরো না। একটু ভেবেচিন্তে কাজ করো। এখন পুলিশে কেস করে কী হবে। দুষ্কৃতীদের এখন কি আর খুঁজে পাবে পুলিশ? অর্পিতার দিকে চেয়ে বলে – ওদের মুখগুলো মনে আছে তোদের? আগে দেখেছিস কখনও ওদের? অর্পিতা নীচু স্বরে বলে – না। পিসি বলতে থাকে – কেস করলে বাড়িতে পুলিশ আসবে। পাড়াপ্রতিবেশী জানাজানি হবে। ভুলে যাচ্ছ কেন মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ওর শ্বশুরবাড়ির কানে কি কথাগুলো যাবে না ভেবেছ? ওরা কেন এই উটকো ঝামেলায় পড়তে যাবে? বিয়েতে বেঁকে বসলে তখন কী হবে? তাই বলি – চুপচাপ থাক। যা হওয়ার হয়েছে।

মায়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দু'টো জল ভরে উঠছিল স্নিগ্ধার। বড় পিসি সেটা লক্ষ করে বলল – কীরে, কী হল তোর? স্নিগ্ধার গালে হাত বুলিয়ে বলে – ভুলে যা তো সব। যা, রাজেশ বসে আছে।

স্নিগ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনল পিসি ভগবানের উদ্দেশে বলছে, ঠাকুরের অশেষ কৃপা, দুষ্কৃতীদের হাত থেকে আমাদের মেয়েকে রক্ষা করেছেন তিনি। দরজাটা টেনে বাইরে বেরিয়ে গেল স্নিগ্ধা।

(অঙ্কন-অভি)

মাকে জড়িয়ে ধরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল স্নিগ্ধা। অর্পিতাও কাঁদছিল। খবর শুনে সেই রাতেই তার পিসিরা চলে এসেছিল বাড়িতে। স্নিগ্ধার মা-ই বলেছিল পুলিশে কেস করার কথা। বাবাও বলেছিল – রাতেই থানায় যাওয়া দরকার। বৃষ্টিটাও তো কমে এসেছে। বড় পিসি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে – দাঁড়াও, সব ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো কোরো না। একটু ভেবেচিন্তে কাজ করো। এখন পুলিশে কেস করে কী হবে। দুষ্কৃতীদের এখন কি আর খুঁজে পাবে পুলিশ

অণুগল্প

মৎস্যমুখ

কিংশুক চক্রবর্তী

দীর্ঘ রোগভোগের পর মৃত্যু হয়েছে জয়ন্তবাবুর। শেষের দিকে তরল পদার্থ ছাড়া কিছুই খেতে পারতেন না। বাবার সেবা শুশ্রূষার জন্য লায়েক ছেলেরা সব সুবিধার বিস্তর আয়োজন করেছিল। ডাক্তার বদ্যি থেকে মল-মূত্র পরিষ্কার করার সেবাদাসী কলাপীর মা পর্যন্ত। জয়ন্তবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। কোনও কিছুতেই তিলমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি রাখতে চায়নি আত্মজেরা। প্রচুর দানধ্যান করা হয়েছে। কাঙালিভোজন করানো হয়েছে এমনকি বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে পর্যন্ত। ছেলেদের এ হেন দরাজ হাতে খরচা দেখলে জয়ন্তভাবু হার্টফেল করে মরেই যেতেন। কারণ তিনি ছিলেন হাড়কিপটে একজন মানুষ।

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছেলেরা বেশ খরচা করে ক্যাটারিং ডেকে মৎস্যমুখের আয়োজন করেছে। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছে সমাজের একেবারে উঁচু তলার মানুষ। মেনুতে মহার্ঘ্য সব লোভনীয় পদ। এ সব খুব আদর করে খেতে হয়। এ তো মাঠে শালপাতা বিছিয়ে কাঙালিভোজন নয় যে লাবড়া এবং মুসুরের ডাল দিয়ে শুরু এবং শেষ হয়ে যাবে।

কলাপীর মা শ্রাদ্ধের দিন পেটপুরে কাঙালি ভোজ খেয়েছিল। আজকেও সে এসেছে। সামনের কামিনী ফুলের গাছতলায় বসিয়ে রেখেছে অসুস্থ স্বামী, গর্ভবতী মেয়ে কলাপী এবং ছোট দুই ছেলেকে। কিন্তু ক্যাটারিংয়ের ছেলেরা মাগনায় প্লেট দিতে নারাজ। মহার্ঘ প্লেটের হিসেব রাখতে হচ্ছে ক'টা গেল।

সাঁঝবেলায় ছেলেরা মাথায় কুলো বসিয়ে চলল ঘরের পিছনে জঙ্গলে মৃত পিতার প্রেতভোজন রেখে আসতে। মহার্ঘ্য ভোজ্য বস্তু জঙ্গলে সাজিয়ে, ধূপধুনো দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে ছেলেরা বাবার কাছে ক্ষমা চাইল যাতে এই সামান্য আয়োজনে তিনি কুপিত না হন।

ওদিকে জয়ন্তবাবুর মৎস্যমুখ পার্টি জমে উঠেছে ইতিমধ্যে। খিল খিল হাসি, টুংটাং পিরিচের শব্দ, মিথ্যে প্রশংসায় চারদিক গমগম করছে। কিছুদূরে সেই জঙ্গলে টিমটিমে প্রদীপের শিখায় প্রেতভোজন আরম্ভ হয়েছিল। রকমারি সুস্বাদু খাদ্য সম্ভারকে ঘিরে গোল হয়ে পাঁচজন সাধ মিটিয়ে হাতের চেটো চেটে চেটে খাচ্ছিল। তাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পাড়ার কয়েকটি কুকুর। তারাও বুঝতে পারছে না ওরা আসলে কী, মানুষ না প্রেত জাতীয় কিছু?

ভালোবাসার ইমন

সুভাষরঞ্জন দাস

মেঘমাখা গোধূলি। অনতিদূরে সাঁঝের হাতছানি। কলেজ থেকে বেরোতে আজ রুমেলার দেরি হয়ে গেছে। তার উপর বাস থেকে নেমে দেখে তেমাথার মোড়ে একটাও রিকশা নেই। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথে এগোতে থাকে। বৃষ্টি শুরু হয়, সঙ্গে বাতাস। দুরু দুরু বুক। বিদ্যুৎ চমকায়। দূরে বাজ পড়ার শব্দ। ফাঁকা রাস্তা। আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিছুটা যাওয়ার পর সামনে রাস্তার পাশে একটা নির্জন দোকানঘর। কোনও কিছু না ভেবে সে ওখানে চালার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ পেছন থেকে দু'টো লোক তার মুখ চেপে ধরে দোকানের পিছনে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে। প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করে রুমেলা। পারে না। তার চিৎকার নির্জনতায় মিলিয়ে যায়। আবার বাজ পড়ে। একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। কাছে আসতেই রুমেলা প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে। গাড়ির ভিতরে থাকা ঋষির কানে একটা করুণ আকুতি আছড়ে পড়ে। দোকানের কাছে এসে গাড়িতে আলো জ্বালিয়ে রেখে নেমে পড়ে। কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পায় না। কাউকে না দেখে সে তখন গাড়িতে উঠতে যায়। হঠাৎ গোঙানির শব্দ। অকুতোভয় ঋষি দোকানের দাওয়ায় ওঠে। কাউকে দেখতে না পেয়ে পিছনের দিকে যায়। এমন সময় অন্ধকার চিরে একটি মেয়ের গলার কাতরানির শব্দ। বিদ্যুতের আবছা আলোয় ঋষি দেখে দু'টো লোক একটা মেয়েকে জাপটে ধরেছে। বাঘের মতো গর্জন করে ঋষি লোকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। মেয়েটাকে ছেড়ে লোক দু'টো পালিয়ে যায়। ঋষি মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে বসিয়ে দেয়। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে গাড়ি নিয়ে মেয়েটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়। এরপর পরিচয় থেকে আলাপ। বিডিও ঋষির ভালোলাগা ভালোবাসার ইমন রাগের স্রোতে বয়ে চলে। তারপর! তার আর পর নেই, শুধু বয়ে চলা। ঢেউ খেলানো মাঠ আর মেঘমুক্ত রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকভরে সবুজ বাতাস নিয়ে দু'জনে এক নৌকায় ভেসে চলে অনায়াস ছন্দে।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক